সাদা কালো

মতি মুখোপাধ্যায়

মোটামুটি দু'খানা মোবাই। একটা ওর নিজের। বিয়ের অনেক আগে থেকে কেনা। ঘোর অমাবস্যা রঙের। গাঢ় নীল আলো বেরোয় শরীর থেকে। অনেক দামি। দেখতে সুন্দর। অন্যটা ফুলশয্যার দিনে আমার দেওয়া। ধবধবে সাদা। হলদে আলো বেরোয় ভেতর থেকে। মৌটুসি হাতে নিয়ে বলেছিল, ইস্, এ যে বিধবার থানের মতো সাদা। তারপরে হলুদ আলো। আহারে, বেচারার বোধ হয় জন্ডিস্ হয়েছে।

মুষড়ে-পরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, কাছে এসে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলেছিল, কিছু মনে করলে নাকি? আসলে ইয়ারকি করে বললাম।

কালো মোবাইলে মৌটুসির দিনভর ফোন আসে। মিসকল হতে দেয় না। বাথরুমে গেলেও নিয়ে যায়। ফোন এলে ডান কানে চেপে ধরে হাসতে হাসতে, কখনো নিচু গলায়, আবার ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দায় কথা বলে। অনেকক্ষণ কথার পর, 'প্লিজ ছাড়ো এবার, জেদ করোনা। ঠিক আছে। ঠিক আছে, দিচ্ছি।' এসময় গভীর চুমুর শব্দ কানে আসে।

সাদাটায় আত্মীয় স্বজনের ফোন আসে। মৌটুসি সেটাকে বাঁকানে চেপে, দু'চার কথা বলার পর, 'ফোনে বেশি টাকা নেই ভাই। রাখছি, কেমন?' বলে যথাস্থানে রেখে দেয়।

প্রায় এরকম ঘটনা দেখে বলেছি, 'তোমার মহব্বত দেখছি কালোর সঙ্গে। সাদাটাকে এত তাচ্ছিল্য কর কেন বুঝিনা।'

মৌটুসি বলে, কী করবো বলো? সাদাটায়, 'ও কেমন আছে, তুমি কেমন আছো, পিসিমনির প্রেসারটা বেড়েছে, ঠান্ডা লাগিও না, এসব শুনতে শুনতে বোর হয়ে গেছি। কালোটায় তো এসব কথা হয় না। তুমি তো জানো, আমার বন্ধুরা ওটাতে কত প্রাইভেট, মজার মজার কথা বলে, কত ইন্টিমেসির গল্প। তাছাড়া কী জানো, ওরা চায়, দিনে কি রাতে অন্তত একবার করে ফোন করতে বলে, ওরা খুব অভিমানী। বেশিক্ষণ কথা না বললে মনে খুব কষ্ট পায়। হাজার হোক তোমার সঙ্গে তো একমাস মাত্র, ওরা কিন্তু আমার টিনেজার বয়েস থেকে ছায়ার মতো আছে। ছাড়তে চায়না। ছেলেদের স্বভাব তো তুমি জানো।

প্রেমভূক বিয়ে

বিমান চট্টোপাধ্যায়

কম্পিউটার খুলতেই স্ক্রিনে ভেসে উঠলো একটি সুন্দরী যুবতীর মুখ। জিনস্ আর টপ্-এর সঙ্গে শরীরের বেদম যুদ্ধ। চুলের লকস্, হাসির হাতছানি—সব কিছু নিয়ে যেন জীবনের জামদানি।

উল্টোদিক থেকে হেঁটে এল এক স্মার্ট যুবক। স্বপ্নমাখা চোখ, টিকালো নাক। মেয়েটিকে দেখে হাসিতে অদ্ভুত উচ্ছ্বাস। তারপর দুজনে হাতে হাত— নিরিবিলি গাছতলায়। নির্জন দুপুর। ছবিটা একটু কাঁপছিল। তাই আমি কম্পিউটারের লেখাগুলো একটু এনলার্জ করে দিলাম।

অতঃপর মেয়েটি বিয়েতে রাজি হওয়ার পর শুরু হল কথা—

ছেলেটি — অবশেষে তুমি রাজি হলে! সত্যিই আমি আর সইতে পারছিলাম না।
মেয়েটি — তুমি কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?
ছেলেটি — অবশ্যই না! এ নিয়ে কখনও ভেবো না তুমি।
মেয়েটি — তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?
ছেলেটি — অবশ্যই...সারা জীবন...
মেয়েটি — আমাকে কখনও ধোঁকা দেবে?
ছেলেটি — নাঃ! এ ধরনের কথা তোমার মাথায় আসছে কীভাবে?
মেয়েটি — তুমি কি আমার চুল নিয়ে খেলা করবে?
ছেলেটি — নিশ্চয়ই! যতবার সুযোগ পাব...।
মেয়েটি — আমাকে কখনও আঘাত করবে?
ছেলেটি — তুমি কি পাগল! আমি মোটেই সেই ধরনের মানুষ নই।
মেয়েটি — আমি কি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?
ছেলেটি — হ্যাঁ।

মেয়েটি --- প্রিয়তম!

তিন বছর বাদে কম্পিউটারের স্কিনে আবার ওরা দুজন। বিয়ে হয়েছে তিন বছর হল। জিজ্ঞাসা করলাম— কেমন আছ তোমরা?

দুজনেই গম্ভীর। বললো—কেমন আছি? তিন বছর আগে আমাদের বিয়ের আগের প্রেমালাপটা তো আপনার কম্পিউটারে আছে। খুলে একবার পড়ে নিন না? বিয়ের পর কেমন আছি জেনে যাবেন। তবে এবার নীচ থেকে পড়ে উপরে উঠুন।

সেই মত কম্পিউটার খুলে আমি সেই পুরোনো লেখাটা নীচ থেকে পড়ে উপরে উঠি।

পাঠক, উত্তর পেতে আপনিও সেইভাবে ডায়ালগগুলো তলা থেকে পড়ে উপরে উঠুন। জেনে যাবেন, কেমন আছে ওরা।

ষাটের ফাঁট

কৃষ্ণা ঘোষ ঠাকুর

সরমা অফিস থেকে অবসর নিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরল। একজন সহকর্মী সঙ্গে ছিলেন। তিনি বিদায়ী সম্বর্ধনায় যেসব জিনিসপত্র সরমা পেয়েছিলেন— তা সরমার নির্দেশিত জায়গায় রেখে তাকে প্রণাম করে চলে গেলেন। সরমা একটু বিষণ্ণ মনেই জিনিসগুলো দেখছিলেন। কাল থেকে আর অফিস যেতে হবে না। কী করে সময় কাটবে। এসব নানা ভাবনায় আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। কলিংবেলের শব্দে কাজের মেয়ে আলোকে ডেকে বললেন, দরজা খুলে দিতে। আলো এসে বলল, দিদি তোমার পিয়ন এসেছে, ডাকছে। সই করে চিঠি নিতে হবে। সরমার বিষণ্ণ মনটা একটু প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

পিয়ন বলল, আপনি সরমা পাত্র। সরমা শুধু বলল হুঁ। পিয়নটি তাকে বলল, একটা ক্যুরিয়ার চিঠি আছে আপনার—সই করে নিন।

সরমা ভাবল, কে তাকে চিঠি লিখল। আজকাল তো চিঠি লেখা বন্ধ বা উঠে গেছে। গুচ্ছের এল. আই. সি. বা বিদেশী ব্যাঙ্কের নানা ধান্দার খাম আসে। হাতের লেখাটা তার চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু কার তা বুঝতে পারলেন না।

কৌতূহলী মন নিয়ে খামটা খুললেন, ওমা! এ যে সবিতাব্রত-র হাতের লেখা। হ্যাঁ গোটা গোটা অক্ষরে তলায় লেখা— ইতি সবিতাব্রত দত্ত। সরমা একটুও দেরি না করে চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন—

প্রিয় সরো,

আজ ৩১শে মার্চ তোমার অবসরের দিন। আমি কেমন মনে রেখেছি বল। আমি তো গত সেপ্টেম্বরেই অবসর নিয়েছি। শুধু এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হ্যাঁ দিনটাকে ধরেছি। নানা কারণে, তুমি সময় মতো বয়সে আমায় বিয়ে করতে চাওনি। বেশ করেছো। আমি কিছু মনে করিনি। এতবছর তোমার জন্য বসেছিলাম। তুমি বলেছিলে অল্প টাকায় তুমি সংসার করতে পারবে না। সত্যিই তো। আমার মাইনে খুব কম ছিল। তুমিও চাকরি করতে না। আর ছেলেপুলে এবং আরও ঝামেলার কথা বলেছিলে। মোটকথা বিয়ে করতে চাওনি আমায়। কিন্তু এখন দেখো, আমার কোন অভাব নেই— তুমিও অবসর নিলে। কেউ নেই তোমার শুনেছি। একা থাকো। আমি বলি কী এখন দেখো তুমিও একাকী, আমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে অবশ্য নয়। আমার এখন টাকার অভাব নেই, তোমারও নেই। আমি তো সব মিলিয়েয় কুড়ি লাখ ও পেনশন দশ হাজার সামথিং পাচ্ছি। তুমিও ভালো টাকা পেয়ে যাবে। কোনো ঝামেলা নেই। ছেলেমেয়ে হবে না। চাই না। ছেলেমেয়ে দিয়ে কী হবে? ওদের তো খালি টাকাগুলোর দিকে নজর থাকতো। তোমায় আমায় কি দেখতো? আপদবালাই ভাবতো। আর কবে মরবো তাই ভাবতো। কেন, মরবো কেন? সরো, তুমিও বাঁচবে আমিও বাঁচবো, যৌথভাবে বাঁচবো। ল্যাভিসলি থাকবো। কন্টিনেন্টে যাবো, প্যাকেজ ট্যুরে। আরও কত কী করব। আমার রাতদিনের যে মেয়েটা আছে ওরও তিনকূলে কেউ নেই। ও বাড়িতে থাকবে। মেয়েটা খুব বিশ্বাসী। সব কিছু করবে। তুমিও ফ্রি, আমিও ফ্রি। তিরিশ বছরে তোমার মন শরীর অনেক বদলে গেছে। আরও পরিবর্তন হয়েছে। তাতে কি সরো, তুমিও অবিবাহিত, আমিও। আমি তোমার জন্য ব্যাচেলার রয়েছি। তুমিও আমার জন্য। আমরা আর ব্যাচেলার থাকবো না। কেন থাকবো? কার জন্য থাকবো? সরো, আমি এই দিনটার জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম। তুমিও, ঠিক তাই না! আর কাউকে কেয়ার করবো না। সোজা রেজিস্ট্রি অফিসে যাব, চাইনিজ খাবো। আমি একটা গাড়ি কিনে ফেলেছি। তোমার সেই পুরনো বাড়িটার সামনে কাল আমি সকাল দশটায় যাবো। নোটিশ - ফোটিশ লাগবে না। কাল বৃহস্পতিবার—বারবেলা করবো না, তৈরি থাকবে। নিচে মোবাইল - ল্যান্ট লাইনের

নম্বর দেওয়া রইল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি আসবেই। রেজিস্ট্রির পর আমি যে ছোট্টা ফ্ল্যাটটা কিনেছি, সেখানে গিয়ে উঠবো। ফ্ল্যাটটার নাম রেখেছি বিহংগম। আমরা পাখির মতো আকাশে উড়বো।

চিঠিটা পড়ে সরমার অবসরী মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। কারেক্ট! এখনই তো বিয়ের সঠিক সময়। সে স্মার্টলি ফোন করল— হ্যালো, এটা কি সবিতাব্রতর বাড়ি?

উত্তর এল হ্যাঁ সরো, আমিই বলছি।

সরমা বলল, চিঠি পেয়েছি। আমি ঠিক দশটায় রেডি থাকবো।

আধা-আধি

সজল দশগুপ্ত

ত্রিনাথ ফোনে খুব সাহস দিল আমাকে— 'একটা পয়সা কাউকে দিবি না। আমার দায়িত্ব। আমি দেখব ওরা কী করে তোর কাজে বাগড়া দেয়।

ত্রিনাথ সোম একথা বললে বুকের ছাতি বেড়ে আটচল্লিশ হলে ত দোষের কিছু নেই। পুলিশ মানে এ বাজারে ভগবান। আর ত্রিনাথ ত যেমন তেমন পুলিশ না। লালবাজারের এ্যান্টি-রাউডিজমের এ-সি। গুন্ডা বদমাস পিটিয়ে ঠান্ডা করাই ত ওর কাজ। কত যে অল্‌রেডি ঠান্ডা করেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সেই ত্রিনাথ আমার বাল্যবন্ধু। অর্থাৎ আমাকে কে পায়? তবে আমি ত অনেকটাই চাঁদের মত। অপরের আলোতে আলোকিত। নিজের কিছু নেই। না আছে ধার, না আছে ভার। কিন্তু ত্রিনাথ আমার বন্ধু এটা কি কম থাকা? ক'জনের থাকে এমন রাশি?

এই জোরেই তেড়ে দিলাম ছেলেগুলোকে— 'পয়সা দিয়ে জমি কিনেছি। পয়সা দিয়ে বাড়ি বানাব। কারও দয়ায় ত আসিনি। ক্লাবকে টাকা দিতে হবে কেন? এক পয়সাও দেব না।'

এমন টৈ-টম্বুর তেজ দেখে ওরা একটু থিতিয়ে গেল। একটু ধরা গলায় আমতা আমতা করে এক জন বলল— 'না, মানে একটা আব্দার করছি আমরা। ছাদের ঢালাইটার জন্য সাহায্য চাইছি। এটা ত আপনারও ক্লাব। আপনি আমাদের অভিভাবকের মত থাকবেন। যা বলবেন শুনব।'

আমি আমার গলায় বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সুর এনে বললাম। —'আমি শুধু আমার অভিভাবক। অন্য কারও অভিভাবক হওয়া বা থাকার কোন বাসনা নেই। একটা পয়সাও দেব না। এবার যান। আমার কাজ আছে।'

কাউকে পরোয়া করে কথা বলার কোনো অর্থ হয়? এ্যান্টি-রাউডিজমের এ-সি আমার বন্ধু। ইয়ার্কি নাকি? ত্রিনাথের কথা কিন্তু ফাঁকা আওয়াজ নয়। নয় যে সেটা বুঝলাম দিন কয়েক বাদেই ওখানে যেতে। ভিত-পুজো হয়ে গেছে। এবার ভিত কাটা হবে। সে জন্য গেছি। তখনই শুনলাম থানা খুব স্টেপ্ নিয়েছে। দুজনকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে। যদিও পরদিনই ছেড়ে দেয়। তাতে কী হল: একবার হাজতবাস ত হল। এই ত সবে শুরু। এবার দেখ তোদের অবস্থা কি করি! নতুন এক ঝামেলার শুরু হল ত।

ক'দিন বাদে গিয়ে দেখি ইটের পাঁজার অর্ধেক নেই। মাথায় হাত আমার। কে নিল, কারা নিল। পাঁজা পাঁজা ইট ত সবারই পড়ে থাকে। ইট ত কেউ আর তালাচাবি মারা ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে রাখে না বা শোবার ঘরেও পাঁজা করে রাখে না। কী করি এখন?

আমার ভরসা ঐ একজন - ত্রিনাথ। ত্রিনাথকে খুব উত্তেজিত গলায় ফোন করি। চুপচাপ সব শুনে 'দেখছি' বলে ত্রিনাথ ফোন রেখে দেয়। নিরুত্তাপ উদাসীন।

কী মনে করে একদিন নিজেই হাজির হলাম ঐ ক্লাবে। একটা রফা করতেই হবে। ত্রিনাথ আর কিছু করবে বা করতে পারবে বলে মনে হল না। ছেলেগুলোর সঙ্গে রফাই করে ফেললাম। 'না, না, ঢালাইয়ের খরচ দিতে পারব না। সাকুল্যে হাজার তিনেক দেব।' শেষে তাতেই রাজি। সব শেষে ক্লাবের সেক্রেটারি চা খাওয়ালে। শেষে চুপিসারে কানে কানে বললেন — 'আপনার দেওয়া পুরো টাকাটাই কিন্তু ক্লাব পাবে না। এ অর্ধেকটা থানার। গুনে গুনে অর্ধেক নেবে। একটা ঘষা পয়সাও কম না। ওরকমই শর্ত। এসে বলে গেছেন। 'ধর-পাকড় করব। ঘাবড়াবেন না। সকালে ধরব, বিকেলেই ছেড়ে দেব। তবে আধা-আধির একটা ফার্দিংও কম হবে না।

আমি ত অবাক। হতবাক হয়ে তাকিয়ে সেক্রেটারি ভদ্রলোকের দিকে। নিজেকে আদ্যন্ত এক বোকা লোক মনে হয়।